মানবধর্ম বনাম রাজধর্ম

-বিপ্লব

বউঠাকুরানীর হাট উপন্যাসে অত্যাচারী অহংকারী প্রতাপাদিত্যকে রাজধর্ম বনাম মানবধর্মের পার্থক্য বোঝাতে চেয়েছিলেন তারই ভাই সন্নাস্যীতুল্য বসন্তরায়। বসন্তরায়ের মানবধর্ম প্রতাপের ক্ষমতাক্রুমর চোখে দুর্বলতার চিহ্ন-তা নিশ্চিহ্ন করতে প্রতাপ পাঠিয়েছিলেন দুই পাঠানকে। এম্পায়ার এন্ড এসাসিন সিনেমতেও কুইন রাজবংশের প্রথম সম্রাট-যিনি সমগ্র চীনকে একত্রিত করে ছিলেন- সেই শি হুয়াং বিশ্বাস করতেন রাজ-ক্ষমতার উৎস হচ্ছে জনগণের রাজদন্ডের প্রতি ভীতি। ২২১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সানরাজ্য ছিল শি হুয়াং এর শেষ বাধা-এর বিদ্রোহী জনগন কিছুতেই পরাধীনতা মানে নি-ফলে শানরাজ্য দখলের জন্য এক ভয়ংকর অভিযানের নির্দেশ দেন শি হুয়াং। একদিনে বৌ-বাচ্চাদের সামনে সমস্ত পুরুষকে মেরে ফেলা হয়-যাতে শানরাজ্যে হাজার বছর পরেও কেও চিনাসম্রাজ্যের প্রতি বিদ্রোহের সামান্যতম মনোবিলাসও না রচনা করে। এই সিনেমাতেই আমরা দেখব সম্রাটের বংশীবাদক বাল্যবন্ধু-যার সা রে গা মা তাকে মৃত্যুকবরের খাদেও সাহস জুগিয়েছে-সে সম্রাটকে বারবার জানাচ্ছে মানুষের ধর্ম না মানলে কখনোই নরপতি হওয়া যায় না-দেশের সম্রাট হওয়া আর মানুষের সম্রাট হওয়ার মধ্যে বিস্তর ফারাক।

সিপিএম এর নন্দীগ্রাম অভিযানও বাহুবলের সেই অপার মহিমাকে স্মরণ করালো। অপর্ণা সেন, মৃণাল সেন, ঋতুপর্ণ ঘোষ, শীর্ষেন্দুদের অরাজনৈতিক প্রতিবাদে সেই চৈনিক বংশীবাদক সুরকারকেই দেখলাম আমরা।মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব বাবুর ইয়ারদোস্ত ইনারা-অথচ এদেরকেই ধরে লকআপে পুরে দেওয়া হল (মৃণালসেনকে বাদ দিয়ে-উনি প্রথমে আন্দোলনে নামেন নি)। ১৯৭০ এর সেই নক্সালি উত্তাল দিনেও এমন হিংসা, শাসকদের এত অহংকার দেখেনি বাংলা। যেভাবে নির্বিচারে গুলি চলেছে-তা একমাত্র সিনেমাতেই দেখতে অভ্যস্ত আমরা-বিরোধী, শাসকদল উভয়ের হাতেই বন্দুক! পুলিশ নেই, আইন নেই, আদালত নেই-এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুরে শুধু বন্দুকের শাসন। যেমনটা হয় আমরা জানি পাকিস্থানের উজরিস্থানে।

নন্দীগ্রাম আসলেই একটা ব্লক-শখানেক গ্রামের সমস্টি। বছর খানেক আগেও সেখানকার সবাই ছিল বামফ্রন্টের সমর্থক। কেও ভয়ে, কেও ভক্তিতে। যাইহোক বঙ্গের সমস্ত গ্রামে একই দৃশ্য। একপার্টির রাজত্ব-বিগত সোভিয়েত বা চীনের কায়দায়। সামান্য পার্থক্য আছে। এখানে পার্টিতে গণতন্ত্র আছে। ফলে পার্টির একাধিপত্য থাকলেও ব্যাক্তির ডিক্টেটরশিপ গড়হাজির। তাই ক্ষোভটা কিছুটা চাপা থাকে-কারন পার্টির মধ্যে গণতন্ত্র থাকার কারনে, আনুগত্য জাহির করলে ইনসাফ মেলে। ব্যাতিক্রম শুধ্য একটা জিলা-মেদিনীপুর। অধুনা ভাগ হয়েছে পূর্ব এবং পশ্চিমে। এখানে পুর্বে লক্ষন শেঠ বলে এক বাহুবলী এবং পশ্চিমে দীপক সরকার বলে এক অধ্যাপক নির্লজ্জ ভাবে পার্টির গণতন্ত্রকে হত্যা করে একাধিপত্য কায়েম করেন। সিপিএম এর বিরোধীদের কথা ভুলে যান-পার্টির মধ্যেই জনপ্রিয় নেতাদের হত্যা এবং মারধর করে গোটা মেদিনীপুরে নিজেদের একনায়কতন্ত্র জারি করেন এই দুই নেতা। এই জিলায় সিপিএমএর নেতারা এদের অনুগত কায়েমী স্বার্থের লোক। সিপিএম এর জননেতাদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন এই দুই বাহুবলী। ফলে মেদিনীপুরে জনবিচ্ছিন্ন হয়েছে সিপিএম এবং ন্যায়বিচারের অভাবে বেড়েছে

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

জনরোষ-যার প্রতিফলন আমরা দেখেছি কেশপুর ২০০১। অধুনা নন্দীগ্রাম ২০০৭।পশ্চিমবঙ্গে আদালত, পুলিশ বলতে কিছু নেই-আদালত কোন রায় দিলেও, তা কার্যকর করা যায় না পার্টির অনুমোদন্ না পেলে। ফলে জমি, ডিভোর্স ইদ্যাদি সহ সমস্ত বিবাদের মীমাংসা হ্য় পার্টি অফিসে।পার্টি যা রায় দেয় তা না মানা অসম্ভব-জলে বাস করে কুমিরের বিরোধিতা আর কি! কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে লোকে পার্টির কাছে যাচ্ছে কেন বিবাদ মেটাতে? কারণ পার্টির আভ্যন্তরীন গণতন্ত্র-ফলে খুব পক্ষপাতদুস্ট রায় এরা দেন এমন নয়। তার ওপর উকিলের খরচ নেই। সবাই মানতে বাধ্যও হয়। এইভাবেই গ্রামাঞ্চলে জনপ্রিয় হয়েছে পার্টির সমান্তরাল প্রশাসন-পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে ভারতের আইন চলে না-চলে পার্টির আইন। যারা এর বিরোধি-তারা সবাই শ্রেনীশত্রু। ডঃজিভাগো সিনেমাই ঠিক যেমনটা দেখেছেন-হুবহু সেই সব দৃশ্য।

গত ডিসেম্বরে নন্দীগ্রামে ক্যেমিকাল হাব হওয়ার কথা ঘোষনা করেন বুদ্ধদেব-এক তরফা ডিসিশন নেওয়া হল গ্রামের লোকেদের সাথে পরামর্শ না করেই। লক্ষন্ শেঠের মতন স্থানীয় রাজা উজিররা ভাবলেন প্রজাদের আবার ইচ্ছা অনিচ্ছা কি-তুলে নিয়ে টাকা দিয়ে অন্য কোথাও বসিয়ে দিলেইতো হল। গরীব মানুষ, হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই-তাদের আবার জমির প্রতি টান নিয়ে ভেবে কি হবে! ভুল বুঝেছিলেন। গত ত্রিশ বছরে এই লাল ঝান্ডার তলায় ভাষা খুজে পেয়েছে গ্রামের মানুষ। তারা জানে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ কিভাবে গড়তে হয়। জানুয়ারী মাসে পুলিশ ঢুকতেই জ্বলে ওঠে নন্দীগ্রাম। হাজার হাজার পুলিস তাড়া খেয়ে পালালো-কেও কেও মারাও গেল। এর পরে আক্রোশ গেল সিপিএম সমর্থকদের বিরুদ্ধে-তাড়া খেয়ে লোকাল এম এল এ ইদ্রিশ আলি পালালেন। সিপিএম এর প্রায় দশহাজার সমর্থকরা প্রাণ হাতে করে নন্দীগ্রাম থেকে বহিস্কৃত হল।সেটা এবছরের ফেব্রুয়ারী মাস। বুদ্ধ বেগতিক দেখে নন্দীগ্রাম থেকে ক্যেমিক্যাল হাবের পরিকল্পনা তুলে নিলেন-ক্যেমিক্যাল হাবের নতুন ঠিকানা নয়াচর বলে একটি গাঙ্গেয় দ্বীপ।

মার্চের পনেরো তারিখে নন্দীগ্রাম পুনর্দখলের অভিযান চলল গভীর রাত্রে-বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং তার সাথে সি পি এম এর কিছু পোষা বন্দুকবাজ ঘিরে ফেলে নন্দীগ্রাম। চোদ্দজন গ্রামবাসী মারা যায়। প্রতিরোধের পুরোভাগে ছিল শিশু এবং মায়েরা। ভিডিও দেখে আমি নিশ্চিত এই প্রতিরোধ কোন উস্কানি নয়-জ়ণগণের বিদ্রোহের ভাষা। নন্দীগ্রামবাসী শহিদ হলেন-মোচরালেন না। সাথে সাথে এটাও বুঝলেন সি পি এমকে ঠেকাতে লাগবে আর ও বন্দুক। অনেক অনেক বন্দুক। ভারতে বন্ধুকের নল সব থেকে বেশী আছে মাওবাদী নক্সালদের। এরা সুযোগ খুজছিলেন। ১৫ ই মার্চের হত্যাকান্ডের পর, মাওবাদিরা শক্ত ঘাটি পেয়ে গেল নন্দীগ্রামে। গ্রেনেড মর্টার ঢুকলো। ল্যান্ড মাইন বসানো হল। নন্দীগ্রাম তখন যুদ্ধসাজে সজ্জিত বিচ্ছিন্ন দ্বীপ।সিপিএম নেতারা চেস্টা করছিলেন তাদের উদ্বাস্তু সমর্থকদেরকে ঢোকানোর-কিন্তু এরা সংবিধান বা আইন আদালতের চেয়ে রাজনৈতিক সমাধানে আস্থা রাখেন বেশী। নন্দীগ্রামের ভূমিউচ্ছেদ কমিটি সিপিএম পার্টির নেতাদের ওপর বিশ্বাস রাখে নি- ১৫ ই মার্চের ওই হত্যাকান্ডের পরেতো আরোই নয়। ফলে সর্বদলীয় বৈঠক ব্যার্থ হয়েছে। ক্রমশ এক আসন্ন গৃহযুদ্ধের দিকে তিলে তিলে অগ্রসর হচ্ছিল নন্দীগ্রাম। সেটাই আমরা দেখলাম সাত থেকে দশই নভেম্বর। বিভিন্ন জিলা থেকে পার্টি ক্যাডার এনে ঘিরে ফেলা হয়েছিল নন্দীগ্রামকে-সাংবাদিকতো দূরের কথা, মশা মাছিও গলতে দেওয়া হয় নি। তারপর ঢোকে ভারাটে বন্দুকবাজরা। যুদ্ধক্ষেত্রে একদম মিলিটারী কায়দায় কাবু করা হয় ভূমিউচ্ছেদ কমিটির প্রতিরোধকে। প্রথমে

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

কিছু যুদ্ধবন্দি ধরা হয়-পরে তাদেরকেই ঢাল করে দাড় করিয়ে, পেছন থেকে গুলি চালাতে থাকে সিপিএম এর ভারাটে গুন্ডারা। ফলে মাওবাদীরা নিজেদের লোকেদের ওপর গুলি চালাতে চায় নি এবং তারা সেই রাতেই চম্পট দেয়। পরবর্ত্তী তিনদিনে প্রায় তিন হাজার ঘর পুড়েছে- কুড়ি হাজার লোক গৃহহীন হয়েছে।কজন মারা গেছে কেও জানে না। সরকারি মতে পাচজন। সাংবাদিকরা বলছেন প্রায় চল্লিশ জন। বিরোধিরা দাবি করেছে প্রায় দুশোজন। কেও জানে না- কারন এখনো বেওরিশ লাশ উদ্ধার হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই এগারো মাস ধরে নন্দীগ্রামকে উজরিস্থানে পরিণত করার দায় কার? কেও কেন আইন-আদালতের সাহায্য চাইল না? সরকার কেন আধাসামরিক বাহিনী চাইল দশমাস বাদে?

এইসব প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে বসলে শুধুই ভেসে ওঠে রাজনীতির কুৎসিত মুখ। মৃতদের জন্য মমতা ব্যানার্জির কান্না আর বুদ্ধর অনুতাপহীণ হৃদয়—এক জঘন্য রাজনৈতিক মুদ্রার দুই পিঠ। জমি নেওয়া হবে না বলে জানিয়েছিলেন বুদ্ধ-তবুও সেখানে সিপিএমকে ঢুকতে বাধা দিয়েছে তৃনমূল সমর্থিত ভূমিউচ্ছেদ কমিটি। ফলে দশ হাজার সিপিএম সমর্থক উদবাস্তুর মতন জীবন কাটিয়েছে গত দশমাস। স্কুল-কলেজ বন্ধ। কৃষিকাজ ব্যাহত। তবুও এই অরাজকতা চালিয়ে গেছে তৃণমূল-কেন? কার স্বার্থে? নন্দীগ্রামের মানুষদের স্বার্থেতো অবশ্যই নয়। সেখানে ভূমি অধিগ্রহণের প্রশ্নই ছিল না গত দশমাস।

আসলে এরা দেখাতে চাইছিলেন সিপিএমকে সশস্ত্র আন্দোলন করে তাড়ানো সম্ভব। সামনেই পঞ্চায়েত ভোট-এই সিম্বলিজমটা কাজে আসত। তৃনমুল এবং কংগ্রেস-এগুলো কচুরীপানা পার্টি-- সিপিএম বিরোধিতা একমাত্র আদর্শ। তাতেও ক্ষতি নেই- বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে আজো ভোট পরে ৪৭%। অথচ সিপিমের বিরুদ্ধে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলেন না বিরোধিরা। কিভাবে তুলবেন? মমতার নিজের পার্টিতেই গনতন্ত্র নেই-দিদির কথাই পার্টির সংবিধান। দিদির যার ওপর অনুগ্রহ, তিনিই নেতা। এমন স্বৈরাচারী নেতৃত্ব দিয়ে সিপিএম এর মতন সুসংগঠিত দলের বিরুদ্ধে নামা যায় না। ফলে ক্ষমতা দখলের জন্য এরাও বন্দুকের নলকেই ভরসা করলেন। তাতে মানুষের রক্তের হোলিখেলা হলে আর কি এল গেল। শিল্পায়ন ধ্বংশ অনেক পরের ব্যাপার। প্রশ্ন উঠবে সিপিএমের লেঠেলের বিরুদ্ধে বন্দুক না ধরলে, পালটা পথ কি? এসব হঠকারি যুক্তি। জনগণকে পাশে না পেলে কোনদিনই গনতন্ত্রে ক্ষমতা পাওয়া যায় না। সিপিএম এর লেঠেল থাকতে পারে, কিন্তু সঙ্গে জনগণও আছে-সেটাই তাদের ক্ষমতার আসল উৎস। পশ্চিমবঙ্গে বিরোধি রাজনীতি যারা করে, তাদের কেওই জনগনের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়-আমরা দেখলাম অপর্ণা সেন তাদের আন্দোলনে মমতাকে সামিল হতে দেন নি। এই হচ্ছে বিরোধী নেতৃত্বের গ্রহনযোগ্যতা! ফেইলড বক্স অফিস।

এবার ভাবা যাক সিপিএম নন্দীগ্রামের এই উজরিস্থান অরাজকতা দশমাস সহ্য করল কেন? কেন কেন্দ্রীয় বাহিনী অনেক দিন আগেই ডাকা হল না? এটা বুঝতে বিট্রান্ড রাশেলের 'ক্ষমতা' র তত্ব সাহায্য করবে। পৃথিবীর কোন রাস্ট্রের ভিত্তিই ভালোবাসা নয়-রাস্ট্রযন্ত্রের

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

প্রতি জনসাধারনের ভয়ই হচ্ছে ক্ষমতার উৎস। সিপিএম যেহেতু সমান্তরাল প্রশাসন চালায়- এক্ষেত্রে পার্টিই মূল রাস্ট্রযন্ত্র। নন্দীগ্রামের বিদ্রোহ অন্যত্র ছড়িয়ে পড়লে, ক্ষমতা উৎসশ্রোত ধাক্কা খেত। সমস্যা হচ্ছে তাহলে সেনাবাহিনী না ডেকে, নিজেদের বন্দুকবাজির অপর ভরসা করা কেন?

কারন সেনাবাহিনী 'রাস্ট্রের' শক্তি-পার্টির নয়। সেনাবাহিনী দিয়ে নন্দীগ্রাম দমন করলে, সিপিএম এর সমান্তরাল প্রশাসনিক রাস্ট্রের কতৃত্বের লঘুকরন হত-যা ভোটের আগে মোটেও অভিপ্রেত নয়। ফলে সংবিধান বহির্ভুত শক্তি দিয়ে এই অসাংবিধানিক 'রাস্ট্রকে" (পড়ুন পার্টির সমান্তরাল শাসনযন্ত্র) শক্তিশালী করার অভিপ্রয়াস।

তাহলে আম-জনতার ভূমিকাটা কি? বুদ্ধবাবু বা মমতাদেবী--- এদের যতই গালাগাল দেন না কেন, এরা আমাদের আত্মারই প্রতিফলন। আমাদের মানসিকতার প্রতিচ্ছবি। বুদ্ধবাবু জানেন এরা বড়জোর চায়ের টেবিলে দুটো গালাগাল দেবে-প্রয়োজন পড়লে পার্টী অফিসেই আসবে-জন সমকক্ষে সিপিএমের বিরুদ্ধে একটা কথা কেও লিখবে না বা বলবে না-কারন সেই স্বার্থের সর্ম্পক। ভেতরে ভেতরে সবাই নচির "এই বেশ ভালো আছি" গাইছে। জনগন যখন দেশের জন্য কিছু করতে চাইছে না-নেতাদের কি দায় পড়েছে!

মাঠে নামার থেকে, পশ্চিমবংগের গনতন্ত্র হাইজ্যাক হয়ে যাচ্ছে বন্দুকের নলে ইত্যাদি জাতীয় ডায়ালোগ মারি চলুন। আমজনতা এর থেকে বেশী রাজনৈতিক ভুমিকা রাখে না!

ক্যালিফোর্নিয়া ১৫ ই নভেম্বর, ২০০৭

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com